প্রেম ও মৃত্যু

লাগের্কভিস্ট্ (অনবাদ ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধায়)

''একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি পথে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আমার প্রিয়ার সঙ্গে। একটা অন্ধকার বিষণ্ণ বাড়ির পাশ দিয়ে যখন আমরা চলেছি, তখন হঠাৎ তার দ্বার মুক্ত হয়ে গেল আর তমসার ভিতর থেকে জনৈক কন্দর্প (Cupid) একখানি পা বাইরে বাড়িয়ে দিলে। সাধারণ শিশু কন্দর্প সে নয়, একটি বিরাট পেশল পূর্ণবয়স্ক মানুষ— সর্বাঙ্গ তার রোমশ। তাকে দেখতে কোনো অসভ্য তীরন্দাজের মতো। একটা কদাকার ধনুকে তীর যোজনা করে আমার বুকের দিকে লক্ষ্য করল সে। তীর ছুঁড়ল —সেটা এসে আমার বুকে বিদ্ধ হল; তারপরই সে পা - খানা সরিয়ে নিলে আর অন্ধকার দুর্গের মতো সেই বাড়িটার দরজা বন্ধ করে দিলো। আমি লুটিয়ে পড়লাম, আমার প্রিয়া এগিয়ে চলল। মনে হল, প্রিয়া আমার পড়ে — যাওয়াটা দেখতে পায়নি। যদি দেখত তাহলে নিশ্চয় থেমে দাঁড়াত, আমার জন্য কিছু করতেও পারত হয়তো। প্রিয়া এগিয়ে চলে গেল — খুব সম্ভব ব্যাপারাটা সে জানতেই পারল না। আমার রক্ত একটা নর্দমার পথ বেয়ে অনেকখানি পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করল — তরপর যখন পথে কেউ রইল না, তখন রক্তের ধারাটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।''

ডাকাতি

সাবিত্রী রায়

মাঠের মাঝখানে প'ড়ো দালান বাড়ীটা ডাকাতি হয়ে গেল মাঝরাতে। মদ খাবে বলে কালো মুখো পরে পিস্তল দেখিয়ে বউয়ের গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে গেল কারা।

সকালবেলা বউটির কান্নায় চোখে জল এল পড়শীদের। পাঁচ বছরের মেয়েটা ভয়ে হিম হয়ে মায়ের গা ঘেঁষে বসে রইল।

ভাব তো একবার, মিঠিসোনা মাথায় উপরে তারায় ভরা আকাশ, সানাইয়ের বাগেশ্রী সুর, এয়োতীদের উলুধ্বনি, বউছত্র দেওয়াল উঠোন লাল বেনারসীপরা ষোড়শী বউ - হাতে মায়ের দিদিশাশুড়ীর রতনচূড়, গলায় পুষ্পহার, কানে ঢেড়া - ঝুমকো — সেই বধূ আজ নিরাভরণ।

পঁচিশ বছর ওভারটাইম খেটে মেয়েকে সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়েছিল তার বাবা বুকভরা পিতৃস্নেহ দিয়ে।

মায়ের বুকের উত্তাপ

সাবিত্রী রায়

শহর ছাড়িয়ে শহরতলির দিকে চলেছে রিকসা। দুধারে ধানক্ষেতে কৃষ্ণপক্ষের রাতের অন্ধকার। তরুণী মায়ের কোলে তিন বছরের শিশুকন্যা। শিশুটিকে শক্ত করে ধরে আছে না। দুজনেরই রক্তের উষ্ণতায় আতপ্ত জীবনের আস্বাদ।

এবড়ো খেবড়ো অসমান রাস্তা - রিকসাওয়ালার হুঁশিয়ারী নজর এগিয়ে চলেছে। ধানক্ষেতের জলে হাওযার সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া একটি শব্দ নেই আশেপাশে কোথায়ও। শুধু রিকসার টুং টুং শব্দ। একবারের জন্যও তালভঙ্গ হচ্ছে না সে শব্দের।

শিশুটি দুহাতে ধরে আছে মায়ের হাত দুখানা নিরাপত্তার পরম বিশ্বাসে। আর দুটি প্রাণীর সবটুকু নিরাপত্তার ভার কাঁধে নিয়ে চলেছে রিক্সাওয়ালা। মুঙ্গের জেলার জলহাওয়ার বড় হওয়ার মজবুত কবজীর জোরে।

কালিমাখা অন্ধকার রাস্তায় এগিয়ে চলেছে রিকসার টিমটিমে আলোর একটি রেখা। সে ভুতুড়ে আলো আরও ভয়াল করে তুলেছে ধানক্ষেতের অন্ধকারকে।

শোনা যায়, এই জনহীন প্রান্তরে একদিন ফাঁসী দেওয়া হতো অপরাধীদের। তাই তার নাম ফাঁসীর মাঠ তাদের প্রতিহিংসার রুদ্ধশ্বাস যেন আজও মিশে আছে ঐ হিমস্তব্ধ প্রেত অন্ধকারে যে কোনও উষ্ণ জীবনকে গলা টিপে মারার জন্য। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া সেই মানুষগুলির দমবন্ধ ভয় জমাট বেঁধে আছে দুরের নখখাগড়ার অন্ধকারে।

নিবিড় করে ধরা শিশুর দেহের উত্তাপ, তার ছোট্ট বুকের স্পন্দন, দুপাশে ঘন ঝোপঝাড় আগাছা, ধানক্ষেত, রিকসাওয়ালা টুং টুং একটানা শব্দ, রিকসার বাতির নিষ্প্রাণ আলো —সব কিছুকে আলিঙ্গন করে হঠাৎ কোথা থেকে ভেসে আসে দোতারার সুর। কোন টালির ঘর থেকে সে ভয় - ভাঙ্গানো সুরটা জলো হাওয়ার পিছু পিছু কিছুদুর এগিয়ে চলে। আবার মিলিয়ে যায় বহুদুর।

তারপর আর সেই ভয় ভয় অন্ধকারে নৈঃশব্দ্য।

একটানা রিকসা চলেছে মোঘল যুগের অশ্বারোহী ডাকহরকরার ঘোড়ার খুরের শব্দের মতো টুং টুং শব্দের ঐক্য ছন্দে।

মশক কেমন করে শশক হলো

বশী আল্‌হেলাল (বাংলা দেশ)

বাপ রে বাপ, মশা মারতে কামান দাগা!

কথাটা তো তাহলে কথার কথা নয়?

উড়োজাহাজ থেকে ওষুধ ছড়িয়ে এবার মশার জাত নিপাত করা হবে এই কথা যখন মশারা শুনল, সমগ্র মেট্রোপলিটন ঢাকার মশারা অগত্যা মিটিং-এ বসে গেল। সভাপতি সিদ্ধান্ত শোনালেন; ওরা যখন আমাদের মেরে শেষ করবেই এসো শেষ খাওয়া খেয়ে নিই।

মশারা ভনভনিয়ে বেরিয়ে একেবারে মরিয়া হয়ে লাখে - লাখে মানুষগণকে ছেঁকে ধরল। তাদের ক্ষুদ্র উদরে আর কত রক্ত আঁটে। তবু তারা মানবরক্ত চুষতে থাকল। কেবল রাতে নয়, দিনে। মানবগণের চপেটাঘাতে অনেক মশা মারা পড়ল। কিন্তু যারা বেঁচে রইল তাদের উদর মানবরক্তের চাপে ফুলে উঠল। বেচারা দুগ্ধ পোষ্য মানবশিশুগণ তো হাত - পা নাড়া ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। প্রধানত তাদেরই তাজা নির্ভেজাল, রক্তে মশারা পুষ্ট হতে থাকল। শেষ পর্যন্ত বাড়তে বাড়তে তাদের এমন বপু হলো যে, হলুদ - হলুদ ফড়িঙের মতো বিমানগুলি উড়ে উড়ে ওষুধ ছড়াল বটে, কিন্তু মশাদের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হলো না। কতগুলি মশার কেবল রক্তশোষক শুঁড় খসে গেল, ইতিহাসের কোন্ অজানা প্রভাতে মানুষের যেমন লেজ খসে গিয়েছিল, যাকে বলে বিবর্তন। একশ্রেণীর মশার দেহের বৃদ্ধির আর বিবর্তন ঘটতে ঘটতে শেষ পর্যন্ত তারা খরগোশ হয়ে গেল।

ঢাকা শহরে মশা এখনো আছে, যেমন পৃথিবীতে বানরও এখনো রয়েছে। কিন্তু একদল বানর যেমন প্রকৃতির খেয়ালে মানুষ পরিণত হয়েছিল। ওই মানুষের খেয়ালেই তেমনই একদল মশাও খরগোশ হয়ে গেল।

মীরপুর চিড়িয়াখানার আশেপাশের জঙ্গলে বাচ্চারা গিয়ে দৌড় ঝাঁপ করলে ওই খরগোশদের দু-চারটি কোত্থেকে বেরিয়ে তীরবেগে ছুটে পালায়। পূর্বে ওদের পাখা ছিল বলেই না আজও এত জোরে ছুটতে পারে। তবে নিরামিষভোজী বানররা যেমন মানুষ হয়ে মাংসভোজী হয়েছে। রক্তপায়ী মশা তেমনি খরগোশ হয়ে, নিরামিষাশী হয়েছে।

যমের উক্তি

সমারসেট মম

বাগদাদের কোন বণিক তার ভৃত্যকে বাজারে পাঠায়, এবং অল্পক্ষণ পরেই ভৃত্যটি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে বললে, ‘‘হুঁজুর, এইমাত্র বাজারে একটি লোক আমাকে ধাক্কা মারলে; মুখ ফিরিয়ে দেখি লোকটি হচ্ছে যম। ও আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল। হুজুর দয়া ক’রে আপনার ঘোড়াটা আমাকে দিন, আমি সামারায় পালিয়ে যাই। সেখানে যম আর আমাকে খুঁজে পাবে না।’’ বণিকের কাছে থেকে সে ঘোড়াটি নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত সামারায় চলে গেল। তারপর বণিক বাজারে গিয়ে দেখল যম স্বয়ং সেখানে হাজির। বণিক জিগ্যেস করলে, ‘‘সকালে আমার ভৃত্য যখন বাজারে এসেছিল তখন তাকে তুমি ভয় দেখিয়েছিলে কেন বল তো?’’ জবাবে যম বললে ‘‘ওকে আমি ভয় দেখাইনি, ওটা আমার বিস্ময় প্রকাশ। ওকে বাগদাদে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ ওর সঙ্গে আমার সামারাতে আজ রাত্রেই দেখা হবার কথা।’’।